

অন্ধবধূ

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

[কবি-পরিচিতি : যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম ১৮৭৮ সালের ২৭শে নভেম্বর নদীয়া জেলার জামশেদপুর গ্রামে। পল্লি-প্রীতি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিমানসের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিসর্গ-সৌন্দর্যে চিত্ররূপময়। রচনায় গ্রামবাংলার শ্যামল স্নিগ্ধ রূপ উন্মোচনে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রাম-জীবনের অতি সাধারণ বিষয় ও সুখ-দুঃখ তিনি সহজ-সরল ভাষায় সহৃদয়তার সঙ্গে তাৎপর্যমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে : লেখা, রেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, বন্ধুর দান, জাগরণী, নীহারিকা ও মহাভারতী। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।]

পায়ের তলায় নরম ঠেকল কী!
আস্তে একটু চল না ঠাকুরঝি -
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল! নয়?
তাইতো বলি, বসে দোরের পাশে,
রাগ্তিরে কাল-মধুমদির বাসে
আকাশ-পাতাল-কতই মনে হয়।

জ্যৈষ্ঠ আসতে ক-দিন দেরি ভাই -
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?
- অনেক দেরি? কেমন করে হবে!
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিন হাওয়া - বন্ধ কবে ভাই;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে -
শ্যাওলা-পিছল - এমনি শঙ্কা লাগে,
পা-পিছলিয়ে তলিয়ে যদি যাই!

মন্দ নেহাত হয় না কিন্তু তায় -
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যায়!

দুঃখ নাইকো সত্যি কথা শোন,
অন্ধ গেলে কী আর হবে বোন?
বাঁচবি তোরা - দাদা তো তোর আগে?
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ি আসার পথ খুঁজে না পাবে -
দেখবি তখন - প্রবাস কেমন লাগে?

'চোখ গেল' ওই চেষ্টিয়ে হলো সারা।
আচ্ছা দিদি, কী করবে ভাই তারা-

জন্ম লাগি গিয়েছে যার চোখ!
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার – ছাই!
কাঁদতে পেলো বাঁচত সে যে ভাই,
কতক তবু কমত যে তার শোক।

'চোখ গেল' – তার ভরসা তবু আছে –
চক্ষুহীনার কী কথা কার কাছে!

টানিস কেন? কিসের তাড়াতাড়ি –
সেই তো ফিরে যাব আবার বাড়ি,
একলা-থাকা- সেই তো গৃহকোণ –
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে –
দরদ-ভরা দুখের আলাপন;

পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মতো
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত!

শব্দার্থ ও টীকা : ঠাকুরঝি – ননদ, স্বামীর বোন, স্বশুরকন্যা। মধুমদির বাসে – মধুর গন্ধে মোহময় সুগন্ধে আচ্ছন্ন। আকাশ-পাতাল – নানা বিষয়, নানান ভাবনা-অনুভাবনা অর্থে ব্যবহৃত। জ্যেষ্ঠ আসতে ক-দিন দেরি ভাই – একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের অনুভবের অসাধারণ এক জগৎ আলোচ্য অংশে ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির বিচিত্র রঙের ধারণা ও অনুভবে এই অন্ধবধু সমৃদ্ধ। সেই জ্ঞান ও অনুভব থেকে সে জেনে নিতে চায় ঋতুর বিবর্তন। অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে যাক – অন্ধবধু অনুভববদ্ধ মানুষ অর্থাৎ তার অনুভূতি শক্তি প্রখর। আত্মমর্যাদা বোধেও সে সমৃদ্ধ। কিন্তু সে অন্ধ। এই অন্ধত্বের কষ্ট সে গভীরভাবে অনুভব করে। দীঘির ঘাটে যখন শেওলা পড়া পিছল সিঁড়ি জাগে, তখন সে পিছল খেয়ে জলে পড়ে ডুবে মরার আশঙ্কা প্রকাশ করে। সে এও অনুভব করে যে, ডুবে মরলে অন্ধত্বের অভিশাপ ঘুচত। কিন্তু কবিতাটির চেতনা থেকে মনে হয়, অন্ধবধু নৈরাশ্যবাদী মানুষ নয়। জীবনের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ আছে। **চোখ গেল** – পাখি বিশেষ। এই পাখির ডাক 'চোখ গেল' শব্দের মতো মনে হয়। **কাঁদার সুখ** – মানুষ দুঃখে কাঁদে, শোকে কাঁদে। কিন্তু কান্নার মধ্য দিয়ে তার দুঃখ-শোকের লাঘব ঘটে।

পাঠ-পরিচিতি : সমাজ দৃষ্টিহীনদের অবজ্ঞা করে। দৃষ্টিহীনেরা নিজেরাও নিজেদের অসহায় ভাবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়সচেতনতা দিয়ে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব। পায়ের নিচে নরম বস্তুর অস্তিত্ব, কোকিলের ডাক শুনে নতুন ঋতুর আগমন অনুমান করা, শ্যাওলায় পা রেখে নতুন সিঁড়ি জেগে ওঠার কথা বোঝা দৃষ্টিহীন হয়েও সম্ভবপর। তাই দৃষ্টিহীন হলেই নিজেকে অসহায় না ভেবে, শুধুই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আপন অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করা প্রয়োজন। বধুটি চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু অনুভবে সে জগতের রূপ-রস-গন্ধ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। কবিতাটিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা সংবেদনশীল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

- ১। তোমার জানা কোনো দৃষ্টিহীন মানুষের বিবরণ দাও।
- ২। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে কর?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ‘অন্ধবধু’ কবিতায় কোন পাখির চৈঁচিয়ে সারা হওয়ার কথা উল্লেখ আছে?

ক. কাক	খ. চোখ গেল
গ. কোকিল	ঘ. শালিক
- ২। ‘মন্দ নেহাত হয় না কিন্তু তায়’ বাক্যটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া	খ. অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি
গ. সকলের কষ্ট দূর করা	ঘ. স্বামীকে দায়মুক্ত করা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

নাসরীনের স্বামী চাকরির সুবাদে প্রবাসজীবন যাপন করছেন। দীর্ঘ সময় ধরে স্বামীর খোঁজ-খবর নেই, তাঁর সঙ্গে যারা বিদেশে থাকেন তারা মাঝে মাঝে আসেন-যান। কেবল তার স্বামীই যেন সবার থেকে আলাদা। নাসরীন স্বামীর জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষার দিন গোনে।

- ৩। উদ্দীপকের বক্তব্যে ‘অন্ধবধু’ কবিতার বধূর কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক. স্মৃতি কাতরতা	খ. বিরহ কাতরতা
গ. প্রতিবন্ধকতা	ঘ. আত্মমর্যাদা

সৃজনশীল প্রশ্ন

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। জীবনের এই স্বল্প সময়ের সমগ্র হিসাব চুকিয়ে, সব সম্পর্ক ছিন্ন করে পরপারে চলে যেতে হয়। গৃহবধু সুদীপা মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন, ‘সুন্দর এই পৃথিবী, ঝাঁ ঝাঁ ডাকা সন্ধ্যা, জোছনা ভরা রাত সব ছেড়ে আমাদের বিদায় নিতে হবে।

- ক. ‘মধুমদির বাসে’ কথাটির অর্থ কী?
- খ. ‘কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে’ পঙ্ক্তিটি দ্বারা প্রকৃতির কোন রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়?
- গ. উদ্দীপকের বক্তব্য ‘অন্ধবধু’ কবিতার যে বিশেষ দিকটিকে আলোকপাত করেছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উদ্দীপকের বক্তব্যে ‘অন্ধবধু’ কবিতার সমগ্র ভাবের প্রতিফলন ঘটেনি”- বিশ্লেষণ কর।